যায়যায়দিন

তারিখ 8 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি দুর্নীতি

সাবেক ও বর্তমান দুই অধ্যক্ষই জড়িত

সাথীয়া খান

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় থাকা দ্বিতীয় স্কুল ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিভিন্ন শ্রেণীর ভর্তিতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এ দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রকাশিত তালিকা মেধার ভিত্তিতে করা হয়নি। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্রীদের প্রথম তালিকায় অধিক নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের বঞ্চিত করে কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তারা প্রথম শ্রেণীর (বাংলা মাধ্যম) ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করে দেখেন, ৩৬-৪০.৫ পর্যন্ত নম্বরপ্রাপ্ত ১৪২৩ জনেরও বেশি এবং ৪১-৫০ পর্যন্ত নম্বরপ্রাপ্ত ২১০ জনেরও বেশি ছাত্রীকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করে ৩৬ নম্বরের কম পাওয়া ৭২ ছাত্রীকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রথম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর ইংরেজি মাধ্যমেও ৩৬ নম্বরের কম পাওয়া সাত ছাত্রীকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রথম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাবেক অধ্যক্ষ তাহমিনা বেগমের সময়ে এ ঘটনা ঘটে। তদন্ত দল অধিক নম্বরপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রীদের বঞ্চিত করে অপেক্ষাকৃত কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের তালিকাভুক্ত করে ভর্তি করা এবং তালিকাবিহীন কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য সাবেক অধ্যক্ষকে দায়ী করেছেন। এসময় ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী মেধাক্রম অনুসারে একটি অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও তা করা হয়নি।

পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগমের সময়ে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হয় এবং সেখানেও একই ঘটনার প্রমাণ পায় তদন্ত দল। এসময়ও ভর্তি পরীক্ষায় অধিক নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের বঞ্চিত করে কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্বাচিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার তদন্ত দলের কাছে বলেন, সরকারি-বেসরকারি, জি বি সদস্য, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদির জোর তদবির এবং শিক্ষকদের মেয়ে অথবা নিকটাত্মীয়, আজিমপুর শাখায় সরকারি কোটা, বোনের বোন ইত্যাদি কারণে ভর্তি কমিটি ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছে। তবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সরবরাহকৃত সুপারিশ তালিকার মধ্যে ৬৮ জন ছাত্রীর ভর্তিতে রেফারেন্স হিসেবে বোন উল্লেখ রয়েছে, ৭৫ ছাত্রীর কোনো রেফারেন্স উল্লেখ নেই। বাকিদের রেফারেন্স দাবি করলেও সুপারিশকারীর স্বাক্ষর সংবলিত কোনো প্রামাণ্য রেকর্ড তদন্তকালে উপস্থাপন করতে পারেননি। দ্বিতীয় তালিকায় সুপারিশের মাধ্যমে ছাত্রী ভর্তির জন্য বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে।

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ২০ থাকলেও এর কম নম্বর পেয়ে বাংলা মাধ্যমে ১৮ জন এবং ইংরেজি মাধ্যমে আটজন ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। এছাড়া দ্বিতীয় তালিকার পর আর কোনো তালিকা প্রকাশ না করে তালিকার বাইরে বিভিন্ন শাখায় বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে মোট ৯০ জনকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে বলে তদন্ত কর্মকর্তারা প্রমাণ পান। এছাড়া ভর্তির তারিখ চলে যাওয়ার পরও ছাত্রী ভর্তির প্রমাণও পেয়েছে তদন্ত দল।

তদন্তে দেখা যায়, সময় চলে যাওয়ার পরও ৯৭ জন ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার আগে আসন সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটিতে আসন সংখ্যার বেশি ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় এক শাখায় অংশগ্রহণ করে নির্বাচিত না হয়েও অন্য শাখায় ভর্তি হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ভর্তির ক্ষেত্রে আরো যেসব অনিয়ম লক্ষণীয়

প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তির নীতিমালা মোতাবেক অধ্যক্ষকে আহ্বায়ক করে প্রত্যেক শাখাপ্রধানের সমন্বয়ে সাত সদস্যের ভর্তি কমিটি গঠন করা হলেও নীতিমালা মোতাবেক ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল শিটে ভর্তি কমিটির সব সদস্যের স্বাক্ষর ছিল না। ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন না করে এবং পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনা ঘটেছে। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছাড়াই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কোনো ছাত্রীর বোনকে প্রান্ত নম্বরের সঙ্গে ৫ নম্বর বোনাস দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তির আবেদন ফরম ও ভর্তি ফরমে উল্লিখিত ছাত্রীসহ পিতা-মাতার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

কেবল প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়, দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ১১২ ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে চার ছাত্রী সাবেক অধ্যক্ষের সময় এবং ১০৮ ছাত্রীকে বর্তমান অধ্যক্ষের সময়ে ভর্তি করা হয়েছে। এ ভর্তির ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির কোনো অনুমোদন ছিল না, সুপারিশের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়েছে, কোনো ভর্তি কমিটি গঠন করা হয়নি, কোনো ভর্তি পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়নি এবং ভর্তিকৃত ছাত্রীদের ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় সব রেকর্ডও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তদন্ত কর্মকর্তাদের কাছে বলেছেন, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা স্বাক্ষরবিহীন স্লিপ, চিঠি পাঠিয়ে বা টেলিফোনে অনুরোধ করেছেন। সুপারিশ অলিখিত হলেও তা উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি বিধায় বাধ্য হয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যান্য দুর্নীতি

ভর্তিকৃত ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তিকালীন আদায়কৃত অর্থ ক্যাশ বইয়ে আয় হিসেবে জমা পাওয়া যায়নি। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত অর্জিত আয় ও ব্যয়ের সমর্থনে কোনো ক্যাশ বই পাওয়া যায়নি। শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত সায়েন্স ক্লাবের মডারেটর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার সায়েন্স ক্লাবের হিসাব দিতে পারেননি। এর আগে আরেকটি তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ক্লাবের লাখ লাখ টাকা আয় ও ব্যয়ের জন্য কোনো হিসাব বই সংরক্ষণ করা হয়নি। তিনি ক্লাবের শুরু থেকে অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ থেকে হিসাব উপস্থাপন করতে পারেননি। এমনকি ব্যাংক হিসাবের তথ্যও উপস্থাপন করতে পারেননি। ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর শামীম জাহানও বিগত পরিদর্শনে ডিবেটিং ক্লাবের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে পারেননি। তার বিরুদ্ধে আরো কিছু অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত দল। রেকর্ডপত্র যাচাই করে তদন্ত দল দেখে, ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ৪৭টি ক্লাস হয়নি।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

৭২ ছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করেন সাবেক অধ্যক্ষ তাহমিনা বেগম।

প্রথম শ্রেণীতে ৭৫ ছাত্রীকে আর দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ১০৮ ছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করেছেন বর্তমান অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার।

লাখ লাখ টাকার আয়-ব্যয়ের কোনো হিসাব নেই।